Kabita Eakhan – Prabandho – Others – 'Kabitar Shahid' Binay Majumder – Alok Mandol

কবিতা এক্ষণ - 'কবিতার শহীদ' বিনয় মজুমদার - অলক মন্ডল

নিঃশব্দে চলে গেলেন নিঃসঙ্গ কবি বিনয় মজুমদার গত ২০০৬ এর ১১ ডিসেম্বর তারিখে অনাদরে, অবহেলায়। জীবনানন্দ - উত্তর বাংলা কবিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বিনয় মজুমদার দীর্ঘ পয়ার ছন্দে নতুন মাত্রা আনেন জীবনানন্দের উত্তরসূরী হিসেবে। আবহমান বাংলা কবিতা এবং পূর্বসূরি কবিদের প্রভাব ছিঁড়ে তাঁর কবিতায় এক নিজস্বতা নির্মিত হয়েছে বস্তুবাদী গাণিতিক আবহাওয়ায়।

কবির জন্ম ১৯৩৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর তৎকালীন ব্রহ্মদেশের মান্দালয় প্রদেশের ছোট্ট শহ থোডো-য়। বাবা বিপিনবিহারী, মা বিনোদিনী। পিতার কর্মসূত্রে বিনয়ের জীবনের প্রথম আট বছর কাটে ব্রহ্মদেশেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে র সময় অবর্ননীয় দুঃখ কষ্টের মধ্যে রণক্ষেত্র ব্রহ্মদেশ থেকে মা - বাবা ও আরও বহু-মানুষের সঙ্গে পাহাড় - জঙ্গল পার হয়ে বালক বিনয় ভারতে ফিরে আসেন। তৎকালীন মুক্তবঙ্গে বিনয় এর পর ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত পৈতৃকবাড়িতে ফরিদপুর জেলার তারাইল গ্রামে কাটান। ফরিদপুরের কৌলতলি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে তাঁর স্কুলশিক্ষা শুরু। দেশভাগের পর পিতা বিপিনবিহারী বর্তমান উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁর নিকটবর্তী ঠাকুরনগর রেলস্টেশনের পাশে শিমুলপুর গ্রামে বসতবাড়ি স্থাপন করেন। মেধাবী বিনয় ভর্তি হন কলকাতার মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে। বিনয় মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন থেকে স্কুল ফাইনাল পাশ করার পর প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আই. এস. সি. পাশ করেন, ভর্তি হন শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে, স্নাতক হন। তিনিই ছিলেন শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র ইউনয়নের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করার পর বিনয়ের স্বল্পকালীন চাকরীজীবন শুরু হয়। প্রথমে কলকাতার অল ইন্ডিয়া হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেল্‌থ, পরে ইন্ডি য়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনষ্টিটিউট। ত্রিপুরা সরকারি কলেজ এবং দুর্গাপুর স্টি লে। অবশেষে সব চাকরি ছেড়ে ২৭-২৮ বছর বয়সে কবিতা চর্চায় পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করে। কবি লিখেছেন /তখন কলকাতার স্কুলে (মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে) পড়ি। মাস্টারমশাইরা ঘোষণা করলেন যে স্কুলের একটি ম্যাগাজিন বেরোবে। আমি একটি কবিতা লিখে ফেললাম, তার একটি পংক্তি এখনো মনে আছে 'ভিজে ভারি হল বে-পথু যূথীর পুষ্পসার'। মাস্টারমশাই-এর হাতে দিয়েছিলাম। তিনি পড়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন'। যদিও তাঁর প্রথম কবিতা ছাপা হয় (পূর্ব) পাকিস্তানে কৌলতলী উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের ম্যাগাজিনে ১৯৪৭ সালে। তাঁর বিশ্বাস ভালো কবিতা অন্ধকার ঘরে লুকিয়ে রাখলেও একদিন না একদিন তা প্রকাশ পাবেই।*

' এক পুরোদস্তুর কবি' বিমলচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের পর 'সাহিত্যপত্রে'র ব্যবস্থাপক কবি বিষ্ণু দে-র সঙ্গে আলাপ হয়। এই 'সাহিত্যপত্রে' বিনয়ের সম্ভবত প্রথম কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ, 'নক্ষত্রের আলোয়' প্রকাশ করেন দেবকুমার বসু, 'বিশ্বজ্ঞান' প্রকাশনীর কর্ণধার, দর্শক পত্রিকার সম্পাদক দেবকুমার বসু কবির মোট ৬টি কাব্যগ্রন্থ ('নক্ষত্রের আলোয়', 'গায়ত্রীকে', ফিরে এসো চাকা' 'আমার ঈশ্বরীকে', 'ঈশ্বরীর কবিতাবলী' ও 'অধিকন্তু') প্রকাশ করেন, কবি তাঁর 'আত্মপরিচয়ে' লিখেছেন 'কবিতা জগতে আসা প্রবেশ পত্রিকায় কবিতা ছেপে নয়, বই ছেপে। কলকাতায় আর কোনো কবির জীবনে হয়েছে কিনা জানি না'। কবির নিত্যকারের কবিজীবন আরম্ভ হয় দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'গায়ত্রীকে' (১৯৬১) প্রকাশের পর থেকে। এই কাব্য প্রত্যাখ্যাত প্রেম অসহ্য ধিক্কারে আত্মলীন'। বাংলা কাব্যজগতে ঢেউ তোলে। 'গায়ত্রীকে' কাব্যগ্রন্থের ১৪টি কবিতা সমনের ৬৩ টি কবিতা নিয়ে ৬২ সালে ৭৭ টি কবিতার সংকলন 'ফিরে এসো চাকা' প্রকাশিত হয়, কাব্যমহলে সাড়া পড়ে গেল, 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা গোষ্ঠীর কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় কাব্যগ্রন্থটির ভূয়সী প্রসংসা করে বিতর্কিত গদ্যে লিখলেন) 'ছবির পর ছবি উপমার পরে উপর্যুপরি উপমা বিনয়ের বৈশিষ্ট্য এবং বিনয়ের মধ্যে যে অসামান্য বিনয় আছে তাঁর প্রকাশ দেখি এই কাব্যগ্রন্থে। এই প্রাচুর্যময় অস্থিরতার মানে, বিনয়ের ব্যক্তিগত জীবনের পরিচয় যে পেয়েছে তার কাছে অনেক পরিচ্ছন্ন, বাকি সকলেরই গ্রাহ্যগ্রাহ্যের বাইরে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কাব্যগ্রন্থটি আলোচনায় 'সনাতন পাঠক' নামে লেখেন- 'বিনয় মজুমদারের মতন কবি পৃথিবীর যে - কোন দেশেই দুর্লভ, কবিতাগুলি এক নজর পড়লেই বোঝা যায়, দুর্লভ এক কবির হৃদয় বা মস্তিষ্ক এগুলি রচনা করেছে। এই কবিতা চৈতন্যের অনেক ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। এই কবিতা উপভোগ করার, আলোচনার নয়'। যেমন 'আমি মুগ্ধ;উড়ে গেছো ! ফিরে এসো, ফিরে এসো চাকা,/ রথ হয়ে, জয় হয়ে চিরন্তন কাব্য হ'য়ে এসো,/ আমরা বিশুদ্ধ দেশে গান হবো, প্রেম হবো, অবয়বহীন/ সুর হ'য়ে লিপ্ত হবো পৃথিবীর সকল আকাশে'। 'এমন বিপন্ন আমি, ব্যক্তিগত পবিত্রতা হীন।/ যেখানে - সেখানে মুগ্ধ মলত্যাগে অথবা অসীমে/ প্রস্রব করার ফলে শিশুর গোপন কিছু নেই/ ফলে পিপীলিকা শ্রেনী কুসুমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। 'বিদেশী ভাষায় কথা বলার মতন সাবধানে/ তোমার প্রসঙ্গে অসিত;অতীতের কীর্তি বাধা দেয়'/ হে আশ্চর্য দীপ্তিময়ী, কীটদষ্ট কবিকুল জানে,/ যারা চিত্রকর নয়, তাদের শৌখিন শিল্পায়নে/ অলেখ্যের মুখে চুল, ওষ্ঠ - সব কিছু আঁকা হয়।/ সে - মুখের অধিকারিনীর স্নিগ্ধ রূপ/ আলেখ্যে আসে না; ফলে সাধনা ও ডুবুরি রয়েছে।

/অভিজ্ঞতা থেকে ক্রমে আকাশের বর্ণহীনতায়/ সংবাদের মতো আমি জেনেছি তোমাকে, বাতাসের/ নীলাভতা হেতু দিনে আকাশকে নীল মনে হয়'।

তাঁর কবিতা আমাদের আস্তে আস্তে একটা চেনাশোনা অভিকর্ষের বাইরের দিকে টানতে থাকে। 'ফিরে এসো চাকা' কাব্যগ্রন্থে কবির সমস্ত জীবন এবং কবিতাকে একটা প্রচন্ড একমুখী আবেগে টেনে বেঁধে রেখেছেন এক নারী। পরে যিনি নিজেকে মুক্ত করে ঈশ্বরীর মত চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছেন। (বেশ কিছুকাল হল চলে গেছ প্লাবনের মতো', অথবা নেই কোন দৃশ্য নেই, আকাশরে সুদূরতা ছাড়া* বা আর যদি না-ই আসে। ফুটন্ত জলের নভোচারী/ বাষ্পের সহিত যদি বাতাসের মতো না-ই মেশো,/ সেও এক অভিজ্ঞতাঅগনন কুসুমের দেশে' -ফিরে এসো চাকা'র এই লাইনগুলি কবিতার ইতিহাসে চিরস্থায়ী হবার মতো। তাঁর কবিতার সৃষ্টি রহস্য বিশ্লেষণের অতীত। তাঁর কবিতায় যে বিচ্ছেদের অনুভূতি আছে তা সার্বিক ঠিকই, কিন্তু তিনি নিজেই একটি ভূমিকায় এর আত্মজৈবনিক উৎস স্বীকার করেছেন 'একজন বান্ধবীকেন্দ্রিক এই শুধুমাত্র/ প্রেমার্তির কাব্যখানি যথাযথ/ দিনপঞ্জী বিশেষ। প্রত্যেক শিল্পকর্মই বিশেষ অভিজ্ঞতার কঙ্কালকে পরিণত করে প্রতীকের সার্বজনীনতায়। এ কবির ক্ষেত্রেও কোন এক বিশেষ নারীর জন্য কামনা পরিণত হয়েছিল সব মানুষের স্পর্শাতীত কোন অস্তিত্বের সঙ্গে মিলিত হবার তৃষ্ণায়। যেমন, -'বাতাস আমার কাছে আবেগ মথিত প্রতীক/ জ্যোৎস্না মানে হৃদয়ের দ্যুতি, প্রেম, মেঘ শরীরের/ কামনার বাষ্পপুঞ্জ, পুকুর আকাশ, সরোবর,/ সাগর, কুসুম তারা অঙ্গুরীয়-এ সকল তুমি'।

কবিতার বিষয়বস্তু থেকে শৈলীপ্রধান হয়ে ওঠে অদিরসাত্মক 'ঈশ্বরীর' (১৯৬৪) কাব্যগ্রন্থে। এই কবিতা পাঠক সমাজ গ্রহণ করেননি কবিলতাগুলির ছন্দ এবং ধ্বনি মাধুর্য খুব ভালো হওয়া সত্ত্বেও। 'অধিকন্তু' কাব্যগ্রন্থে (১৯৭২) কবির নিসর্গের কবিতা আরম্ভ হতে দেখা গেল। কবির নিজের কথায় - 'নিসর্গ - বর্ণনামূলক কবিতা - বড় কবিতা লিখি গাছের ছায়ায় আকাশের ছায়ায় বসে, লিখতে ভাল লেগেছিল। শহরের কোনো কোলাহল নেই। অথচ শহরের থেকে বেশি দূর নয়...অনেকদিন ধরে কবিতা লিখেছি আমার এই গ্রামে বসে'।

কবির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য 'অঘ্রানের অনুভূতিমালায় (১৯৭৪) আছে নিসর্গ বর্ণনা-মূলক ৬টি দীর্ঘ কবিতা। কবিভাবনায় সমগোত্র পায় গণিত ও কবিতা। কবি তাঁর আত্মপরিচয়ে বলেছেন /আমার ধারণা অঘ্রানের অনুভূতিমালা কম আশ্চর্যজনক নয়।* নামহীন মিলেমিশে ছটি ঋতুর স্রোতধারা আলো আঁধার জন্ম মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে চলে অনন্ত কালে। শরীর মনে রোমাঞ্চ জাগে ঘ্রানময় অস্তিত্বের, পাঠকের সঙ্গে ভিতর বাহির তাদের রাত্রিক্রিয়া...। বাইরের দৃশ্যময় প্রকৃতি বিশ্বের সঙ্গে কবির জৈব আকাঙ্খার সংগীতময়পৃথিবী একাকার হয়ে যায়।

কবিতার সরাসরি গণিতের ব্যবহার করার নতুন ধরনের চেষ্টা দেখা দিয়েছিল কবির মধ্যে 'একটি বেলুন যদি গ্যাসভর্তি অবস্থায় সিধে-দক্ষিণের দিকে/ উড়ে যেতে থাকে/ এবং সে বেলুনের গায়ে যদি অতিশয় ছোট এক ছিদ্র থাকে/ তা হলে কী হয় ? তাহলে এ' বর্গ এবং ওয়াইয়ের বর্গ এবং জেডের বর্গ যোগ/ করে নিলে'

সেই বিনয় আবার লেখেন 'একটি বৎসর শুধু সাল্যময়ী অগ্নির আকাশে/ বসে বসে সাদালাপে কাটিয়েছি অবকাশকাল। তারকারা ঋতুচক্রে সরে গেছে, এ-সব বোঝেনি।' তাঁর কবিতায় উঁকি মারে জীবনানন্দের বোধ, চেতনা। কবি বলেছেন 'মূলত আমি গণিতবিদ, আমার অধিকাংশ সময় কাটে গণিত চিন্তায়। আর কবিতা, মানুষ যেরকম কাজের অবসরে সুন্দর বাগান করে তেমনি।'

কবির সবথেকে বিতর্কিত কাব্যগ্রন্থ 'বাল্মীকির কবিতা' (১৯৭৬)। এই গ্রন্থ তাঁকে অপমান করেছে পদে পদে, গ্রামে শহরে। এতে জীবনের এক অসহ্য স্বাদ ও সত্যের অপ্রিয়তা প্রকাশ পেয়েছে। 'সরস্বতী পূজা' 'শাড়ি কেনা', কবিতার খসড়া ৭.১০, 'মহাচীনের ঘোড়া' কবিতাগুলো বাংলায় কেন যে কোনো ভাষার উল্লেখযোগ্য কবিতা, কেননা সাহিত্যে যৌনতাও যে প্রয়োজনীয় বস্তু একথা আমরা আজ জেনেছি। ১৯৮১ সালে কবির কাব্যগ্রন্থ 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' (দে'জ), এবং ১৯৮৫ সালে দুটি কাব্যগ্রন্থ 'আমাদের বাগানে' এবং 'আমি এই সভায়' প্রকাশিত হয়। 'আমি এ সভায়' কাব্যগ্রন্থে কবি অলংকারশূন্য ও সহজ হয়ে গেছেন। চলতে চলতে যা দেখেছেন, শুনেছেন, ভেবেছেন তাই লিখেছেন। কোনো উপমা নয়, বিলাস নয়, গূঢ় দর্শন নয়। তবু কত সুন্দর, বিশ্বজনীন আবেদন আমাদের মুগ্ধকরে এই কবিতাশূন্য কবিতায়। কাব্যগ্রন্থের 'আমার কথা'য় কবি লিখেছেন 'মহাবিশ্বের প্রতিটি ঘটনাই সমগ্র বিশ্বব্যাপারের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনেটিই বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। এই বিপুল বিশ্বতার সম্পর্কে বিস্ময়বোধ করা ছাড়া একজন কবি আর কি করতে পারে। এবং ঘোষণা করেছেন 'যে সমস্ত কবিতা প্রকাশিত হয়েছে এ সবই আমার দিনপঞ্জী', যেমন '-বহুপথ আছে আমার শিমুলপুর গ্রামে।/ এইসব পথ হেঁটে গ্রামবাসীদের সারা জীবন চলেছে,/ আমাদের গ্রামে আছে সুপ্রশস্ত পীচঢালা আধুনিক পথ,/ চওড়া মাটির উঁচু

প্রাগৈতিহাসিক পথ আছে।/ এসব প্রধান পথ থেকে বেরিয়েছে আরো নানা শাখাপথ।/ যেগুলি প্রকৃতিপক্ষে মানব ইতিহাসের সমান বয়সী'।

তাঁর কবিতা ঠিক একবার পড়ার কবিতা নয়। তাঁর কবিতার প্রতিক্রিয়া কখনই তাৎক্ষণিক নয়। পড়ার পর বেশ কিছুক্ষণ তা মনের মধ্যে থেকে যায়। একটা নিজস্ব জগৎ তৈরি করে। এবং বারবার সেই জগতে ফিরে যাওয়ার জন্য হাতছানি দেয়। 'মানুষ নিকটে গেলে প্রকৃত সারস উড়ে যায়' অথবা জীবনের কথাভাবি, ক্ষত সেরে গেলে ত্বকে/ পুনরায় কোশোদগম হবে না কখনও' লাইনগুলি মিথ হয়ে গিয়েছে।

'কবির 'কাব্যসমগ্র' 'হাসপাতালে লেখা কবিতাগুচ্ছ' বাংলা সাহিত্যের সম্পদ'। কৃত্তিবাস পুরস্কারের পাশাপাশি কাব্যসমগ্র খণ্ডের জন্য ২০০৫-এ রবীন্দ্রপুরস্কার এবং 'হাসপাতালে লেখা কবিতাগুচ্ছ' কাব্যগ্রন্থের জন্য সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পান। জীবনের শেষদিনগুলি বড় বেদনায় লিখেছিলেন, সময়ের সঙ্গে-এক বাজি ধরে পরাস্ত হয়েছি। ব্যর্থ আকাঙ্খায়.../ একদিন পালকের মতো ঝরে যাব।*।

কবিতার শহীদ' পরিশীলিত কবিতা নির্মাণে যেমন কাব্যবৈদগ্ধ্য পরিস্ফুট হয়, তেমনি কবিতা ও গণিতের এমন এক সমাহার যা হয়তো ইতিহাসে আর কোথাও কখনও হয়নি। তিনি বাংলা কবিতার বিষয় ও ছন্দের কথা বলতে গিয়ে অনেক ছোট ছোট প্রবন্ধ কিংবা কবিতা নির্মাণের ব্যাপার স্যাপার জানাতে রসাত্মক রচনা লেখেন যে গুলোয় অঙ্কের সঙ্গে কবিতার, অঙ্কের সঙ্গে নৈসর্গিক জগতের সম্পর্ক এবং আকর্ষণ-বিকর্ষণ জানা যায়, এবং তাঁর কিছু রচনার কাব্য ও অঙ্ক একাকার হয়ে গেছে। তাঁর কিছু কবিতা অঙ্কে পুরোপুরি অনুবাদ করা হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ফর্মুলার আকারে প্রকারে। কিম্বা যাকে বলা যায় যা অঙ্ক তাই কবিতা, যা কবিতা তাই অঙ্ক। বিনয়ের নিজস্বতা বাংলা কবিতায় এইখানেই, কবির স্রোতের বিপরীতে চলা নিঃসঙ্গ জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভৌতিক ও কাল্পনিক চরিত্র যারা দার্শনিক, গণিতবিদ বিনয় মজুমদারকে মানসিক রোগী করেছে এবং কবিও।